BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link :: https://doi.org/10.70798/Bijmrd/020900019

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 9| October 2024| e-ISSN: 2584-1890

কবিতা ও নাটক : বনফুলের অন্তরঙ্গ জীবন ভাবনা

মৌ দত্ত

সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়

গবেষিকা, Adamas University.

সারসংক্ষেপ:

ঊনবিংশ শতকের পূর্ণিয়া ভাগলপুর সাহেবগঞ্জের গ্রামীণ পটভূমির মধ্যে স্বচ্ছল পরিবারে প্রত্যয়শীল মন নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন বনফুল। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য থাকা বনফুলের গ্রাম্য শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহ তাঁকে সমকালীন শহরের জটিল জীবন-ভাবনা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। হাজারীবাগে পড়াশোনার সুবাদে হিন্দু ধর্মের সংস্কারময় জগৎ থেকে খ্রিস্টীয় জীবনাচার তাঁর মধ্যে ধর্ম-সংস্কার মুক্ত এক অবিচল বিশ্বাস গড়ে তুলল মানুষের প্রতি। তাঁর প্রত্যয়নিষ্ঠ অন্তরঙ্গ জীবন-ভাবনায় নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনায় আবিষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো প্রাণের গভীরে সিঞ্চিত হয়ে ওঠা প্রকৃতির মন্থিত নির্যাস। এরপর ডাক্তারি পড়বার সুবাদে তাঁকে আসতে হলো কলকাতার মেডিকেল কলেজে। দেশকাল বিশ্ব যুদ্ধের বিভীষিকা বনফুলের হৃদয়কে সেদিন আন্দোলিত করতে পারিনি। কিন্তু কলকাতার বুকে মহানাগরিক যুদ্ধ, বিশ্ব যুদ্ধের দামামা, নিরবধি জীবন সংকট বনফুলের আত্মকেন্দ্রিক শিল্পী মনকে ভগ্নপ্রত্যয় বৈনাশিকতার উজান ঠেলে এনে দাঁড় করালো প্রত্যয় ভঙ্গের অস্থিরতাযুক্ত এক নতুন ভাবনার দরজায়। আজন্ম লালিত বিশ্বাস অনুভবের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে থাকা বাস্তব জীবনবোধের প্রেরণা বনফুলকে রহস্যমুখী করে তুলল। মানব জীবন বোধের প্রতীতির শিকড়ে গিয়ে শিল্পী স্বভাবের আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হলেন বনফুল।

ভূমিকা:

পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা যে কোন লেখকের জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু বনফুলের জীবনে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক উদারতা। তাই সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও সর্বসংস্কার মুক্ত বন্ধু বৎসল উদার মানসিকতার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বনফুল। পারিবারিক পরিধির বিশালতা আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ডাক্তার পিতার উদার হৃদয়বত্তার সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল বনফুলের বিরল ব্যক্তিত্ব। শুধু পিতা নয়, ধর্মভীরু মায়ের অসাধারণ ধৈর্য আর স্বামীর সংসারের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে নিজেকে উজাড় করে দেওয়া সেকেলে হিন্দু রমণীর নিঃস্বার্থ অথচ তেজস্বিনী ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতার ছাপও স্পষ্ট বনফুলের ব্যক্তিত্বে। পিতা-মাতার পরে বলাইচাঁদের ব্যক্তিত্ব গঠনে অন্যান্য যাঁদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। একদিকে পিতার সংস্কার মুক্ত উদার জীবনাচার, আর অন্যদিকে কাকার সংস্কারযুক্ত রক্ষণশীল গোড়ামিপূর্ণ আন্তরিক বিশ্বাস ও শিক্ষাদানের মধ্যে বলাইচাঁদের শৈশবের জীবনবোধ কৈশোরের পথে পা বাড়িয়েছিল জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভঙ্গুর অথচ নৈর্ব্যক্তিক জীবন দৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় খুঁজতে

খুঁজতে। বলাইচাঁদের সাহিত্য সাধনার সূচনাও হয়েছিল কাকাবাবুর উৎসাহে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোলানাথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলাইচাঁদের হাতে প্রথম জন্ম নিল পয়ার ছন্দে লেখা ময়ূরকবিতা। মনিহারীর অপর পাড়ে সাহেবগঞ্জের স্কুলে পড়াকালীন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন সময়কে বলাইচাঁদের সাহিত্যচর্চার প্রস্তুতি কাল বলা চলে। বলাইচাঁদের কথায় "ঠিক কোন সময় মনে নাই, কিন্তু মনে হয় আমি যখন থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছি তখনই আমার মনে সাহিত্য প্রেরণা উদ্বেল হইয়া ওঠে।--- সাহেবগঞ্জে বোডিং-এ আসিয়া ঠিক করিলাম একটা হাতে-লেখা মাসিক পত্র বাহির করিতে হইবে। সেকালে বেশ ভালো একরকম ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ পাওয়া যাইত। তাহাই দুই ভাঁজ করিয়া একসারসাইজ বুকের মতো আয়তন হইত। ঠিক করিলাম এই মাপেরই কাগজ করিব। কাগজের নাম দিলাম 'বিকাশ'।"[১]'বিকাশ' পত্রিকায় গল্প কবিতা লেখার মূল দায়িত্ব ছিল স্বয়ং প্রকাশকের। তবে বনফুলের বটুদা ছিলেন এই পত্রিকার একজন গুণগ্রাহী পাঠক। এরপর বটুদার উৎসাহে "১৯১৫ খৃস্টাব্দ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা ছাপা হইল।"[২]

বলাইচাঁদের বনফুল ছদ্মনাম গ্রহণের পিছনেও একটা যুক্তি ছিল। বনফুলের লেখা থেকে জানা যায়, বলাইচাঁদের কিশোর মনে বন ও ফুল শব্দ দুটির প্রভাব ছিল অপরিসীম। "ছেলেবেলায় ভৃত্যমহলে আমার নাম ছিল জংলি বাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোবাসি। --- এই জন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম।"[৩] শৈশব থেকেই বনে জঙ্গলে নানা কীটপতঙ্গ প্রজাপতির পিছনে ঘুরে বেড়ানো বনফুল পরিণত বয়সেও বন জঙ্গলের রহস্য নিকেতনে, পাখি ও ফুল চেনার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতেন। আসলে 'বনফুল' নামের প্রতি শুধু বলাইচাঁদের অনুরাগ ছিল তাই নয়, প্রকৃতির প্রতি বনফুলের এই সহজাত আকর্ষণের প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্যচর্চাতেও।সাহিত্য জগতে বনফুলের আবির্ভাব কবি হিসেবে। "পরিচারিকা' পত্রিকায় 'ঊষা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়১৩২৪ বঙ্গাব্দে,'বনফুল' ছদ্মনামের অন্তরালে।"[৪] বনফুলেরকবি ভাবনার মৌলিকত্বের পাশাপাশি তাঁর শিল্পী চেতনা প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র রসানুভূতির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর "প্রকৃতিঘেঁষা 'ঊষা', 'মৌন', 'দূর্বা', 'প্রদীপ', 'পাখি ও মানুষ'ইত্যাদি অনেক কবিতা"[৫]য়।বনফুলের লেখা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন পত্রিকার পাশাপাশি "আমি যখন ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি (১৯১৮)'প্রবাসী'তে আমার সংস্কৃত হইতে অনূদিত একটি চার লাইনের কবিতা প্রকাশিত হইল।--- কিছুদিন পরে 'ভারতী' পত্রিকাতেও আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হইল।"[৬]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে কল্লোল কালিকলমের হাত ধরে উঠে আসা এক তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আধুনিকতার উন্মাদনায় গা ভাসানোর যে প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল বনফুল কোনদিনই সেই জোয়ারে গা ভাসাতে পারেন নি। একদিকে বাংলাদেশের রবীন্দ্র-বিরোধিতার নামে আধুনিকতার বোহেমিয়ানিজমের উত্তপ্ত আবহাওয়া, অন্যদিকে বাংলায় রবীন্দ্রানুসরণের পন্থা। আবার একদিকে সাহিত্যে গড়ে উঠলো অসীম অখন্ডের ঔপনিষদিক সাধনা, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ভাবনার অন্তরাল থেকে অঘোষিতভাবে উঠে এলো রোমান্টিক উচ্ছ্বাস সম্বলিত দেহাত্মবাদের বিক্ষুব্ধ জীবনাচার।বিংশ শতকের এই যুগপৎ ভাবনার টানাপোড়েন প্রবাসী বাঙালি কিশোর বনফুলের মনে প্রথম পর্যায়ে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি।আসলে "আমরা যখন প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কাহারও প্রভাব অতিক্রম করিব এইরূপ কোনো সজ্ঞান চেষ্টা আমাদের ছিল না। আমরা সে যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতাম, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা পড়িতাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রমোহন সেন, অনুপমা দেবী, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এবং আরো অনেক উদীয়মান কবির কবিতা সাগ্রহে পড়িতাম। ইহাদের সকলের প্রভাব নিশ্চয় আমাদের মনের উপর এবং লেখার উপর পড়িত। কিন্তু আমরা কখনও স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই যে এইসব মনীষীদের প্রভাব মুক্ত না হইতে পারিলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারা যাইবে না।"[৭] বনফুলের সাহিত্য-সাধনার বন্ধন মুক্তি ঘটেছে আমাদের নিত্যযাপনের মধ্যে যা আছে তাকে কেন্দ্র করে। "জীবন-ভাবনায় বৈচিত্র্যের অন্বেষণই ছিল তাঁর সহজাত প্রবণতা। তাঁর সাহিত্যেও তাই পরিকল্পনার অভিনবত্বে, কাহিনীর বৈশিষ্ট্যে ও নির্মাণকলার অসাধারণত্বে এই প্রবণতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ জগৎ ও জীবনের প্রতি অদম্য কৌতূহলই শিল্পীমানসে জন্ম দিয়েছে বৈচিত্র্যের পিপাসা; --- সাহিত্যে প্রতিফলিত বনফুলের এই কৌতূহলী দৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'কৌতূহলের রস'; অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত কিছুর প্রতিই

অনায়াস কৌতূহল বনফুলের শিল্পভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বৈজ্ঞানিক মাত্রায়। এই কৌতূহলের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন বনফুলের অনন্যবিশিষ্ট দৃষ্টির দরুণ রবীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রথম 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'বলে অভিহিত করেন।''[৮]বিজ্ঞান-মনস্কতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই কাব্য বাণী রূপে বনফুলের স্বতন্ত্রকে নির্দেশ করেছে।বনফুলের কিশোর বয়সে লেখা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায় ফুটে উঠেছে বাস্তবতার ছবি :

"ঘরের গৃহিণী ও দেশের জমিদার,
কোলের ছোটছেলে, ভিখারি দরোজার,
আছে কি নাই তার করে না পরোয়াও,
কেবলই মুখে বুলি, "দাও গো দাও দাও।"[৯]

বনফুলের কবিদৃষ্টি

বনফুলের কবিদৃষ্টির মধ্যে কখনো রোমান্টিকতার অভাব ঘটেনি। বৈজ্ঞানিক মেজাজ নিয়ে নিজস্ব স্বতন্ত্রকে বজায় রেখে বনফুলের শিল্পী মন মানবিক আবেগে ভরপুর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর সাহিত্যে। কবিতায় তাঁর ভাবনা যেন তাঁর সেই মানসিকতারই প্রতিরূপ :

"কাঁটায় কাঁটা চারিদিকে
কাঁটায় ভরা দেহ,
কাঁটার ভয়ে আমার কাছে
আসই না ত কেহ।
আসতে যদি সাহস করে,
দেখতে যদি নয়ন ভরে,
সবাই মিলে এমন কোরে
করতে নাক হেয়!
পাছে আমার বাছার গায়ে
আঁচড়টুকু লাগে,
স্নেহ আমার কাঁটা হয়ে
তাইত সদা জাগে!
একটু যদি কাছে এসে
দেখতে চেয়ে ভালোবেসে,
দেখতে তবে কাঁটা এ নয়,
এ যে আমার স্নেহ।''("কাঁটা গাছ")[১০]

বনফুলের শিল্পী চেতনার প্রাণোন্মাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রকৃতি নিয়ে মোহ- মদিরতায় ডুব দিতে না পারলেও, প্রকৃতির রস থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি তাঁর কবিতা। একটা Anti Romantic ভাবনার কাঠামো তাঁর সাহিত্যের বহিরঙ্গে থাকলেও, রোমান্টিক ভাবনার কল্পনা বিলাস তার সাহিত্যে ছিল না। প্রকৃতির গোপন রহস্য রূপ তাঁর শিল্পী মনের

অনুভবের ধাপে ধাপে ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়, গল্পে, সাহিত্যে। কখনো তাঁর কবিতা 'দূর্বা' শিশির দেবতা বালা, সবুজে সোহাগী ধরনের আদুরে অসহায় রূপ নিয়েও দেবতার পূজার সামগ্রী হয়ে ওঠে। আবার কখনো কবিতার কাক ভাগ বসায় দেবতার নৈবেদ্যে। চিরকালে বেয়াদবের মতো আনন্দ উৎসব থেকে শ্মশান প্রাঙ্গণ কাকা শব্দে উন্মত্ত করে তোলে। কৌতূহল পরিহার্য পরায়ণতা বনফুলের ব্যক্তিত্বেরএকটা সহজসাবলীল গুণ। আর সেই গুনেই সত্যি হয়ে ওঠে ঘুঁটে শকুন বেগুন মার্জার মুষিক আস্তাকুঁড়ের ফুল এমনকি ছারপোকার মত স্থূল বিষয়।

বনফুলের কবিতার দিক পরিবর্তন সূচিত হলো কলকাতার জল-হাওয়ায়। শিল্পীর দীর্ঘ লালিত জীবন বোধের সঙ্গে তাঁর ডাক্তারি সত্তার অসহায় যন্ত্রণার এক নিখুঁত প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে তাঁর কলমে –

"বসে আছে যত লুব্ধ শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া;

- -

ভাবে ডাক্তার অসুখে মানুষ পড়িবে কবে
উকিল ভাবিছে কাছারির বেলা কখন হবে

- -

উড়িয়া উড়িয়া ভাবিছে শকুনি
ভাগাড়ে কখন পড়িবে মড়া।"[১১]

বাস্তব জীবন ভাবনার এমন স্মার্ট অভিব্যক্তিতে বনফুল আধুনিক জীবনযাত্রার ভঙ্গুর মেরুকরণের দিকে বারবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বাঙালিদের প্রতিও ফুটে উঠেছে তাঁর তীক্ষ্ণ অভিযোগ—

"ওরে ও বাঙালী, ওরে ও কাঙালী, ওরে ওরে ভিক্ষুক,
পরের দুয়ারে হস্ত পাতিয়া আজো কি রে পাস্ সুখ!
কেরানীর জাতি বলি মারে লাথি উপহাস করে সবে
মানুষের মত যোগ দিবি কবে জীবনের উৎসবে!
সত্যিকারের মানুষ হায় রে সত্যি কি নাই দেশে
মনুষ্যত্ব বিকায়ে সবাই চাকরিই চায় শেষে!
হায় রে কপাল হায়
চাকরি না পেলে বাঙালী-জীবন শুকায়ে মরিয়া যায়!

- -

মানুষ না হলে সহজ-সরল নাহি কোন পন্থাই।
মানুষ হবার সাধনা কোথায়? কই চরিত্র বল?
জীবন-পথের কোথা ওরে তোর সেই সেরা সম্বল!
নির্ভীক প্রাণ, শিক্ষিত মন— কই সে কর্ম-বীর?
এযে দেখি শুধু চাকরি-লোলুপ ভিখারীর যত ভীড়।
ভিখারী কখনও পায় কি শ্রদ্ধা? কে দেবে তাহার মান,

যে জন নিজেরে জীবনে কখনও করিল না সম্মান।”[১২]

জীবন জিজ্ঞাসা, আত্মপ্রত্যয় আর নৈষ্টিক মূল্যবোধের নতুন মন্থন শুরু হল কলকাতার নগর দর্শনকে কেন্দ্র করে। তাঁর আত্মজীবনী পশ্চাৎপটে পাওয়া যায় “যদিও তখন আমি কলিকাতা শহরে বাস করিতাম, কিন্তু আসলে আমি বাস করিতাম একটা আদর্শ স্বপ্নলোকে। যে স্বপ্নলোকে আমার প্রধান সঙ্গী ছিল আনন্দ, আদর্শ, এবং নির্ভীকতা। উৎকেন্দ্রিক গোছের হইয়া পড়িয়াছিলাম অনেকের কাছে। অনেকে বিস্মৃত হইত, অনেকে মজার খোরাক পাইত। সে সময় আমার সাহিত্যচর্চাও অব্যাহত ছিল। কবিতাই লিখিতাম। অধিকাংশই হাসির কবিতা বা ব্যঙ্গ কবিতা। নানা কাগজে প্রকাশিত হইত। বেশীর ভাগ ‘প্রবাসী’তে।”[১৩]নিছক হাসির বা ব্যঙ্গ কবিতা যে সে সময়ে বনফুলের সাহিত্যচর্চার মূল ভাবনা ছিল তাই নয়, হিউমারের হালকা হাসির সঙ্গে মুখে হাসি চোখে জলের করুণ ভঙ্গিমাও ছিল সেখানে স্পষ্ট। তাঁর কবিতার কথাতে তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গরুর আত্মকথা—

“মানুষ তোমার মাংস খাবে
অস্থি দেবে জমির সারে,
চামড়া দিয়ে পড়বে জুতো।
বারণ কে তায় করতে পারে?
তোমার ’পরেই এ অত্যাচার
হে মরতের কল্পতরু,
কারণ? নহ সিংহ কি বাঘ,
কারণ তুমি নেহাত গোরু!”[১৪]

ফুল বা পাখি বিষয়ে বনফুলের আগ্রহের যে শেষ ছিল না সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পাখি তাঁর কাছে নিছক মনুষ্যেতর প্রাণী নয়। পাখি তাঁর কাছে মুক্তির আনন্দ। তাই তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে বন্ধন আর মুক্তির যুগপৎ --

“আকাশ পথে অনেক দূরে দূরে,
স্বাধীন পাখি, বেড়াও তুমি উড়ে
তোমার মত সকল ছেড়ে
উড়তে জানি না,
আকাশপথে তোমার ওড়া
তাইতো মানি না!
আমরা মানুষ, তবু তোমায় চাই!
তাইতো তোমায় বন্দী করি ভাই!”[১৫]

সাহেবগঞ্জের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো কিশোর বনফুলের পুরাতন স্মৃতি যেন জীবনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে কলকাতার বাস্তবতায় অর্থহীন হয়ে পড়ে।তাই তাঁর কণ্ঠে ঝরে আক্ষেপের সুর —

“ফুটিবে যে ফুল, হয়নি যে গান গাওয়া,
অনাগত যাহা হয়নি এখনও পাওয়া,

ভবিষ্যতের মনের গোপনবাণী,
রঙে রঙে ভরা রঙিন জীবনখানি,
অভূতপূর্ব কত স্নেহ ভালবাসা
এঁকে রাখে আশা!
ঐতিহাসিক ও কবি--
একজন শুধু আহরণ করে,
আরজন আঁকে ছবি!"[১৬]

তাঁর এই ভাবনা এক অনাগত সম্ভাব্য গভীর বেদনাকে জাগিয়ে তোলে মনে। হাসির ছলে দুঃখ দিয়ে সমকালকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন বনফুল। মানুষের মনকে সচেতন করতে তাই তিনি বলেন—

"দুরন্ত যৌবনে বল কে রাখিবে অঙ্ক দিয়া ঘেরে
উজ্জ্বল মহিমা তার তুচ্ছ করে সর্ব হিসাবেরে
সদ্য ফোটা কমলিনী আজও চাহে বৃদ্ধ তপনেরে।"[১৭]

আবার বাগদেবীর শাশ্বত রূপস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর 'সরস্বতী' কবিতায়।

"একটি ঋতুর একটি প্রতিমা নহ
প্রতিটি ক্ষণের তুমি ক্ষণ-শাশ্বতী
নিখিল প্রাণের তুমি জীবন্ত-ভাষা
নিখিল গানের অন্তবিহীন গতি।"[১৮]

ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কবিতার মধ্যে দিয়ে বনফুলের উদ্ভাবনী কল্পনা নতুন নতুন বাঁকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় পল্লবিত হয়ে কৌশলী বিন্যাসেস্বতন্ত্র অভিব্যক্তিতে সজ্জিত রঞ্জিত হয়েছে। ছন্দের যাদুকর তিনি ছিলেন না।তবুও তাঁর কবিতার ধ্বনি স্পন্দন কখনো স্বমিল কখনো বা ভাবানুগামী ছন্দে নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করেছে। চতুর্দশপদী কবিতা রচনাতেও তিনি চমকপ্রদ। আবার কখনো কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি মেঘদূতের প্রেমে বিহ্বল হয়ে আষাঢ়ের মেঘমেদুর নিবিড় ঘন অম্বরের ছবি আঁকেন ভাষা ভরা কলমে—

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" সেই দূর উজ্জয়িনীপুরে
কালিদাস নামে কোন গুণী
দূর সে অতীত যুগে আপনার বিরহ ব্যথারে
ভাষা নাকি দিয়েছিল শুনি।
বেজেছিল বুকে তার বিরহের যে বেদনা
প্রিয়াহারা বরষার রাতে
অশ্রুময়ী সে কাহিনী মন্দাক্রান্তা ছন্দ তালে
এঁকে গেছে মেঘদূত পাতে।"[১৯]

আবার কখনও গান্ধীজীর প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধায় তিনি মুখরিত —

"হে মহাপথিক, হে মহা-পথ,
হে মহাসারথি, হে মহারথ,
হে উজ্জ্বল;
নয়ন-জল
নয়নে থাক
শুনেছি বন্ধু তোমারি ডাক,
যুগযুগান্তে সে আহ্বান
মথিয়া তুলিবে পাষাণ-প্রাণ
অসাড় হৃদয়, বারম্বার
নমস্কার।"[২০]

আবার রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকার্তির শান্ত রূপ দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে সংহত হয়েছে তাঁর কবিতায় –

"গঙ্গার কূলে জ্বলেনি জ্বলেনি তাহার চিতা,
সন্ধ্যার বুকে জ্বলে ছিল শুধু সূর্য জ্বালা,
রূপের গীতা
শেষ করেছে যে একটি পালা
নিত্যকালের আকাশে ওই যে দীপান্বিতা
সাজায় তাহার দীপালি মালা।
নিত্যকালের মাটিতে ওই যে শ্যামলী বালা
তাহারি পথেতে পাতিয়া রেখেছে চোখের চাওয়া,
ফুলের মালা
দুলায় বুকেতে দখিন হাওয়া,
তাহারি লাগিয়া গভীর নিশীথে প্রদীপ জ্বালা
নিবিড় ছায়াতে দিবস ছাওয়া।" [২১]

এরই পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

"পাথরের বুকে হাতুরি হেনেছ সারাটা জীবন প্রভু,
পাথর ফাটিয়া ঝর্ণার ধারা বাহির হয়নি তবু
পাথর পাথরই আছে,
ফুলকি উড়েছে দু'চারটি শুধু, রচিয়াছে ইতিহাস,

- - - -

মঞ্চে মঞ্চে সভা আর সভা – মিথ্যা মহোৎসব
দেবতার নয়, মানুষের নয়, মুখোশের কলরব!

- - - -

দেশের বুকের ক্ষত থেকে, দেব, আজও যে রক্ত ঝরে
এখনো বাঙালী বাঙালীই আছে
ভিক্ষাই সম্বল।”[২২]

আবার সিস্টার নিবেদিতার উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন—

“তুমিই কহিলে ডাকি, মহীয়সী নারী,
সুমহৎ সভ্যতার তোমরা যে উত্তরাধিকারী।”[২৩]

বনফুল অবলীলায় অতীত থেকে বর্তমানের মহান প্রাণেদের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা করেছিলেন। আবার অন্যদিকে তিনি নিছক কবি ছিলেন না, ছিলেন প্রেমিকও। লীলাবতী দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর

‘চতুর্দশী – কৃষ্ণা ও শুক্লা’ নামক পর্ব দুটি ইন্দ্রিয় কামনা থেকে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমানুভূতির দ্বিধা পূর্ণ প্রেমাবেগের এক অপূর্ব নিদর্শন। ইন্দ্রিয়গত কামনার মদিরতায় বনফুল যখন বলেন—

“আমার মনের ক্ষুধা নানা মূর্তি ধরিছে কত কি!
বীরত্বে উন্মাদ কভু রুদ্র রসে উঠিতেছে জ্বলি,”[২৪]

তখন প্রেমের অস্থিরতায় তাঁর ব্যাকুল হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে আক্ষেপের সুর,

“আলোকের লাগি আমি আসিয়াছি আলোক-পিপাসী,
জ্বলন্ত শিখার মাঝে করিয়াছি আপনারে দান,”[২৫]

আবার তাঁর সেই উন্মত্ত প্রেম শান্তি খোঁজে ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমে –

“সে আলোক আজি সখি, উদ্ভাসিত তব মুখ ’পরে,
তার দিব্য দীপ্ত বাণী কাঁপিতেছে আঁখিতে অলকে,
জ্যোতির্ময়ী বার্তা তার লেখা তব কপোলে অধরে,
মর্ত মানবীরে ঘেরি অমর্তের মহিমা ঝলকে।”[২৬]

বনফুলের প্রেম কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী পার হয়ে সময়ের কুজ্ঝটিকায় এসে দাঁড়ায় দেশ- মাতৃকারসামনে। সময়টা ১৯৪২। আগস্ট আন্দোলনের বিভীষিকাময় পটভূমিতে অগ্নিময় সংগ্রামের দীপ্ত তেজ বনফুলের হৃদয় বিমোক্ষিত করে জন্ম দিল চন্ডিকা, ধূমাবতী, মহাকালীর বন্দনার মতো কবিতা।তিনি বলেন –

“মৃত্তিকায় স্থান জানি তবু আমি আকাশ-বিলাসী;
শ্মশানে বসিয়া থাকি অমারাত্রে শবাসন ‘পরে

অমৃত আকাঙ্ক্ষা করি;”[২৭]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুসম্পর্কের অধিকারী রবীন্দ্র-গুণগ্রাহী বনফুল রবীন্দ্রানুসারী কবি ছিলেন না। তার প্রত্যয় মগ্ন চিন্তা চেতনা কখনো আপন সত্তার স্বীকৃতি গ্রহণে দ্বিধান্বিত হয়নি। বনফুল ছিলেন যৌবনের পূজারী অমৃত সন্ধানে একজন সাবজেক্টিভ আর্টিস্ট। যৌবনের মন্ত্র বুকে নিয়ে জীবন মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কবি তরুণ সমাজকে আহ্বান জানিয়ে বলেন —

“প্রাণবন্তহে যুবক, নাহি ভয় — নাহি কোন ভয়
অমৃতের পুত্র তুমি জ্যোতিমান তুমি মৃত্যুঞ্জয়”[২৮]

নিজের দেশের প্রতি তাঁর অন্তর বেদনা মথিত হয়ে নৈরাশ্যকে ধিক্কার জানিয়ে সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়ে নতুন চেতনার আশায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে দীপ্ত প্রাণের প্রত্যয়বোধ —

“তুচ্ছ করিয়া জীবন-মৃত্যু উচ্চে তুলিয়া শির
ঊর্ধ্বে রাখিয়া দেশের জাতির মান
ধন্য করিয়া ভারতবর্ষে জাগো আজি তুমি বীর
প্রণাম করিয়া গাহিব তোমারি গান।”[২৯]

কবি প্রত্যয়ে প্রত্যয়ী বনফুল শুধু কবি নন।সাহিত্য সৃষ্টির আগ্রহে বনফুলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে গল্প উপন্যাসের সঙ্গে কবিতা থেকে নাটক সকল পরিধিতেই সমানভাবে সঞ্চারমান ছিল। জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই কবিতার পাশাপাশি নাট্য ভাবনার দ্বারাও বনফুলের শিল্পী মানসের উন্মেষ লক্ষ করা গেছে তাঁর আকাশবাণী, অবিনাশ কিংবা ‘ট্রাজেডি বৃক্ষের আর একটি ফল’ [৩০] নামক কবিতায়। চমক দিয়ে জাগিয়ে তোলা চেতনার স্ফূরণ যেমন তাঁর গল্পের আঙ্গিকে তেমনি নাট্য গুণান্বিত সংলাপ ধর্মিতা জড়িয়ে আছে তাঁর জীবনের নানান প্রকাশভঙ্গিতে। বলা যায় “বনফুলের সাহিত্যদর্শের শ্রেষ্ঠ উপকরণ ছিল তাঁর আত্মসংবরণের সচেতন আগ্রহ। দেখা গেছে যে শিল্পীর এই আত্মপ্রক্ষেণরহিত সংবৃত্ত শৈলীর বশে তাঁর অধিকাংশ গল্পই হয়ে উঠেছে নাট্যধর্মী।”[৩১] মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় থেকেই বনফুলের রসসিক্ত মন নাটক দেখার অভ্যাসে পরিণত হয়। শিশির ভাদুড়ীর বিশেষ অনুরাগী বনফুল রূপকথা নামক একটি নাটিকা লিখে মঞ্চস্থ করার আশায় শিশিরবাবুর কাছে গেলে তিনি বনফুলকে নিরুৎসাহিত না করে বলেন –“নাটক খুব ভালো হয়েছে আপনার। আমার যদি পয়সা থাকত, আমি এটাকে মঞ্চস্থ করতাম।... তবে আপনার নাটক লেখার হাত আছে, ছোটখাটো সামাজিক বিষয় নিয়ে কিংবা আরব্য-উপন্যাসের গল্প নিয়ে নাটক লিখুন। আমি অভিনয় করব।”[৩২]শিশির বাবুর উৎসাহে বনফুল নাট্য রচনায় উৎসাহিত হয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে পাঁচ অংক ও এগারো দৃশ্যে বিন্যস্ত করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘আলিবাবা’ নাটকটির ট্রাজিক রূপ তুলে ধরলেন ‘রূপান্তর’ নাটকের মধ্যে দিয়ে। এই নাটক রচনা প্রসঙ্গে বনফুল জানান “আমার সেই Devil’s den ঘরটিতে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে আড্ডাবসিত। বনবিহারীবাবুও তাহাতে যোগ দিতেন। আনন্দের স্রোত বহিত। এইরূপ কোনো একটা আড্ডায় একদিন Tragedy ও Comedy লইয়া আলোচনা শুরু হইয়া গেল।আমি বলিলাম, একই গল্পে Tragic বা Comic হইতে পারে। বনবিহারীবাবু বলিলেন, ‘আলিবাবা’, নাটকটি কি Tragedy করা সম্ভব?’ আমি বলিলাম – ‘আমার মনে হয় সম্ভব।’। বনবিহারীবাবু বলিলেন— ‘সম্ভব বললে হবে না। হাতেকলমে করে দেখিয়ে দাও।’ সেই সময় 'আলিবাবা' গল্পটা লইয়া 'রূপান্তর' নাটকটি লিখিয়াছিলাম।”[৩৩] নাটকটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে পুস্তকাকারে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নাটকটির বিষয়বস্তু আলিবাবা নাটককে কেন্দ্র করে হলেও আলিবাবা ছিল মূলত হাস্যরস প্রধান রচনা। কিন্তু বনফুল সেখানে রূপান্তর নাটকের মধ্যে কাব্যিক ভাবালুতাকে বাদ দিয়ে, রূপকথার আবরণ ছিন্ন করে, মানব জীবনের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের পরিবেষ্টনীতে তুলে ধরতে চেয়েছেন মানুষের লোভ কেমন করে তার জীবনে পতনের মূল কারণ হয়ে

ট্রাজেডিকে বয়ে নিয়ে আসে। তুলে ধরতে চেয়েছেন এক অসহায় ভাইয়ের হৃদয়দীর্ণ হাহাকার। ভাই কাশেমের মৃত্যু আলিবাবাকে যে চরম মর্ম যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে তারই ছবি স্পষ্ট হয় 'রূপান্তর' নাটকের সংলাপে –

> "আলিবাবা।। চুপ করে রইলি কেন মর্জিনা... আমি বুঝতে পারছি তোরা মনে করছিস আমিই যত অনিষ্টের গোড়া।তাঠিক...তা ঠিক—আমারই দোষ...।কিকরব মা লোভ সামলাতে পারলাম না। ছিলাম গরীব কাঠুরে, খেতে পেতাম না। তার ওপর বললে বনে কাঠ কাটতে দেবে না—পাইকের তাগাদা –
>
> আলিবাবা ।। আর কাশিম বরাবরই ছিল একরোখা—আমি বলতে চাইনি—তবু সে জোর করে জেনে নিলে—জবরদস্তি করে। কেন আমি তাকে যেতে দিলাম—কেন তার পায়ে ধরে বারণ করলাম না। আহা সেই কাসিম— দুষ্ট—গোঁয়ার— সৌখিন— তবু সে আমার ভাই—আমারই ভাই। --- মর্জিনা আমি দোষ করেছি আমায় মাপ কর তোরা।" (রূপান্তর নাটক, পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)।" [৩৪]

পুরাতন নাটকের একটি আধুনিক স্বতন্ত্র রূপায়ণ ঘটিয়ে বনফুল বাংলা নাট্য সাহিত্যে এক অভিনব রসের সঞ্চার করলেন যদিও নাটকটিতে নাট্যরসের তুলনায় গল্প রসের প্রাধান্যই বেশি, তবুও মোহিতলালের স্বীকৃতি রূপান্তর নাটকটিকে যথার্থতাই দিয়েছে "আপনার রূপান্তর পড়িতেছি—আলিবাবা খুব আধুনিক হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে – 'Old wine in a new bottle।'—নয়, 'New wine in an old bottle।" [৩৫]

বনফুল ও ব্যঙ্গ প্রিয়তা

বনফুলের আরেকটি স্বভাব ধর্ম হলো ব্যঙ্গ প্রিয়তা। হিউমার আর স্যাটায়ারের মধ্যে দিয়ে আপাত কৌতুক প্রবণতার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্টতার দিকে তীক্ষ্ণভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি রচনা করলেন নাটক মন্ত্রমুগ্ধ। একটি মনুষ্যেতর প্রাণীকে প্রধান চরিত্রের বিকল্প হিসেবে স্থাপন করে নাট্য সংলাপের মধ্যে দিয়ে পরিবেশনের পাশাপাশি কৌতুক রস ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে লেখকের যে গভীর রসবোধের উৎসরণ ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে তা সত্যিই বিরল। এটিকে নাটক না বলে প্রহসন বলাই ভালো। রবীন্দ্রনাথ এই রচনাটি সম্পর্কে বলেন – "তোমার মন্ত্রমুগ্ধ ঠিক লাইন ধরে' চলেছে, derailed হবার আশঙ্কা নেই। যে পাড়ায় ওর টার্মিনাস সে হচ্ছে হতভাগাদের পাড়া – ভাষায়ভঙ্গীতে ব্যবহারে তাদের ঠিক পরিচয়টি পাওয়া যায়। অতিকৃতি আছে – ব্যঙ্গীকরণ অর্থাৎ ক্যারিকেচ্যুরের দ্বারা বিকৃতিকে স্পষ্ট করার জন্যই তার দরকার।"[৩৬]

মন্ত্রমুগ্ধ মঞ্চস্থ না হলেও চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল বিমল রায়ের পরিচালনায়। উল্লেখ্য মন্ত্রমুগ্ধের চিত্রনাট্য বনফুলের রচিত এবং চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে তিনি মূল কাহিনীর বেশ কিছু পরিবর্তন পরিমার্জন সাধন করেন।

বনফুল উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে জীবনী আখ্যান বর্ণনার তথ্য ভারে নুব্জ হলেও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য রচনার প্রবণতা তখনো দেখা যায় নি। তাই মধুসূদনের জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা সংঘাতকে নাট্যরসে জারিত করে বনফুল সৃষ্টি করলেন তাঁর পরবর্তী নাটক শ্রীমধুসূদন। নাটকটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে আসার থেকে অগ্রহায়ন পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। বনফুলের কথায়, "লেখাটা 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফণীর হাতে দিয়া আসিলাম। 'শ্রীমধুসূদন' ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।"[৩৭] রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের জীবন নিয়ে নাটক রচনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বনফুল বলেন – "ওঁর চরিত্রে নাটকের অনেক উপাদান আছে যে। তাছাড়া ওঁর জীবন চরিত পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে ওঁর কবি সত্তাকে জীবনচরিতকারেরা যথেষ্ট মর্যাদা দেন নি। উনি যে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এইটেই বেশী ফুটেছে যেন। কেন উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কি

উদ্দাম প্রেরণা ওঁকে উচ্ছৃঙ্খল করেছিল, সেটা যেন উহ্য থেকে গেছে।''[৩৮]মধুসূদন এর জীবনের উদ্দাম প্রেরণার অংশটুকুই বনফুল তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর নাটকে মধুসূদনের কবি ব্যক্তিত্বের ট্রাজেডির অন্তরালবর্তী বেদনাকে স্পষ্ট করার জন্য। উচ্ছৃঙ্খলতার হলাহলে দগ্ধ মধুসূদনের শিল্পী স্বভাব ব্যক্তি সত্তার অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহের উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে মহতী বিনষ্টির পরিচয়কে যেভাবে অনাবৃত করে তুলেছিল তারই নাট্যরূপ বনফুলের শ্রী মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিভূতিভূষণ সকলের দ্বারাই বনফুল এই নাট্য রচনার কারণে প্রশংসিত হয়েছিলেন। আসলে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে চরিত্র নির্মাণ কৌশলে বনফুলের প্রকাশভঙ্গি ছিল যেমন যত্নশীল তেমনি নাট্যগুণযুক্ত। শ্রীমধুসূদনের সাফল্য বনফুলকে 'বিদ্যাসাগর' নাটক রচনায় উৎসাহিত করেছিল।

"যখন 'বিদ্যাসাগর' লিখিতেছি, তখন হঠাৎ একদিন বন্ধু প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত আসিয়া হাজির। সে তখন একজন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার। অথচ সাহিত্য-রসিক। সে আসিয়া বলিল, 'বলাইদা, আপনি শ্রীমধুসূদন 'ভারতবর্ষে' লিখেছেন, এটা কিন্তু প্রবাসীতে দিতে হবে।' বলিলাম—'আমার আপত্তি নাই। কিন্তু 'প্রবাসী' কি নেবেন এ লেখা? তাঁরা না চাইলে আমি দেব না। চাইলে নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু পারিশ্রমিকও চাই।' প্রদ্যোৎ বলিল, 'আমি রামানন্দবাবুকে চিঠি লিখেছি। তিনি তোমাকে পত্র দিবেন।' প্রদ্যোৎ চলিয়া গেল। আমি বিদ্যাসাগর লিখিতে লাগিলাম এবং প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কবে রামানন্দবাবুর চিঠি আসিবে। আমার লেখা শেষ হইয়া গেল, তবু রামানন্দবাবুর চিঠি আসিল না। বিদ্যাসাগর লিখিবার পূর্বে সজনীকান্তের কাছে বিদ্যাসাগর- সম্পর্কিত কিছু বই লইয়াছিলাম। সজনী একটি পত্রে জানিতে চাহিল—বই কতদূর লেখা হইল? উত্তর দিলাম, বই শেষ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সজনীর উত্তর পাইলাম— সাতদিনের মধ্যেই আমি ভাগলপুর যাইব। বইটি শুনিয়া আসিব।''[৩৯] সজনীকান্ত বনফুলের বিদ্যাসাগর বইটির পাঠ শুনে লেখাটি ছাপ'বার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বনফুলকে বলেন "চমৎকার হয়েছে। এটা আমি শনিবারের চিঠিতে ছাপব।''[৪০] 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত নাটকটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।এই নাটকের মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের বহুগামিতাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন নাট্যকার বনফুল। বিদ্যাসাগর নাটকটিও শ্রীমধুসূদনের মতো জীবনের তথ্য সম্বলিত বাস্তব জীবনোচিত ঘটনা বহুল নাটক। বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সংলাপের মধ্যে। "পরিবারবর্গের বিরোধিতায় ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর নাটকে ধৃত একটি চিঠিতে লিখেছেন – বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ব প্রধান সৎকর্ম ... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।''[৪১] ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে নাট্য উপস্থাপনার যে প্রতীতিসিদ্ধ রূপটি বনফুল তাঁর রচনায় তুলে ধরেছিলেন সেদিকে লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথও বনফুলকে তাঁকে নিয়ে নাটক রচনার কথা বলেন।এ প্রসঙ্গে বনফুল বলেন – রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে লইয়া যেন আমি একটা নাটক লিখি। কি লিখি? আমার মনের মধ্যে যে নাটকটা রূপ- পরিগ্রহ করিল, তাহা লিখিতে হইলে পড়াশোনা করিতে হইবে। ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের লাইব্রেরী বেশ বড়। কলেজের প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করিয়া লাইব্রেরীটি ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি তো দিলেনই, একটিভালো চেয়ার এবং টেবিলেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হরলালবাবু তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইংরেজীর অধ্যাপক নিশানাথবাবুও আমাকে সাহায্য করিলেন অনেক। ল্যাবরেটরির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া আমি লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। উপকরণ সংগ্রহ করিতে তিন-চার দিন লাগিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরই 'শনিবারের চিঠি'-র একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যায় 'অন্তরীক্ষে' নাম দিয়া এই একাঙ্ক নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নাটকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলাম।''[৪২] বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন'ও 'বিদ্যাসাগর' জীবনতথ্যভিত্তিক ঘটনা প্রধান বাস্তব নাটক। অন্যপক্ষে 'অন্তরীক্ষে' এবং 'শৃণ্বন্তু' যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীবিবেকানন্দের জীবনকেন্দ্রিক লেখকের প্রতীতিসিদ্ধ কল্পনাটা, – কাব্যনাট্য। তথ্যনয়, অনুভব এবং ভাব-কল্পনাই এ দুটি নাটক রচনারভিত্তি।''[৪৩]শৃণ্বন্তু নাটকটি অমৃত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দের কর্ম দীপ্ত ব্যক্তিত্ব কিভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মানসবৃত্তিকে নাড়া দিয়েছিল সেই দিকটিকেই বনফুল

ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নাটকে। "শুধু তাই নয় আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও জীবনের পরিণাম ভাবনা যেন বীর সন্ন্যাসীর আত্মিক যন্ত্রণাকেও উন্মুক্ত করেছে বাণী রূপে। দেশের দশা ও পরিণাম ভেবে আমি আর স্থির থাকতে পারিনা। তোদের মঙ্গলকামনাই আমার জীবনের ব্রত। তোরা সব পচে গলে মরবি আর আমি মুক্ত হয়ে যাব, সে, মুক্তি চাই না।"[৪৪] কিন্তু স্বামীজীর এই মহদ্বাণী তবু ব্যর্থ হয়ে যায় এই পাপিষ্ঠ যুগে ; মন্দির থেকে নির্গত তাঁর বাণীধারাকে কেউ ভাবে বুজরুকি, কেউ বা আবার অলৌকিকতার প্রচার করে অর্থোপার্জনে উৎসাহী হয় এই বাণীকে কেন্দ্র করেই।" সমকালীন স্বার্থান্ধ সমাজ জীবনের আদর্শ চ্যুতি কিভাবে সমাজ জীবনকে বিষময় করে তুলেছে তারই প্রতিচ্ছবি বারবার ফুটে উঠেছে বনফুলের ভাবনায়। পারিবারিক সমস্যাকীর্ণ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর মধ্যবিত্ত নাটকটিতে। কঞ্চি নাটকের মূল বিষয়বস্তু অসবর্ণবিবাহ। ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে কিভাবে বৈদ্য কুলের পাত্রকে বিবাহ করে, কিভাবে সুলতা ও ক্ষিতিশের প্রেম কাহিনী নানা নাটকীয় কৌশলের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করে, তারই সুন্দর নিদর্শন কঞ্চি নাটকটি। বনফুল নারী প্রগতিতে আস্থাবান ছিলেন। তাই সামাজিক সংকীর্ণতাকে পেছনে ফেলে আধুনিক নারীর প্রত্যয় বোধকে স্যালুট জানিয়ে সামাজিক এক উৎকট অসংগতি প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন । বনফুল সচেতন ভাবে এই কমেডি নাটকটি উপস্থাপন করেছেন তিনটি মাত্র অঙ্কে। ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকটি একাধিকবার শখের নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা মঞ্চস্থ হয়।বনফুলেরশিককাবাব বা দশভাণ নাটক গুলিতে একদিকে যেমন শিল্পী মানুষের বিশিষ্টতার দিকটি স্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি শ্লেষাত্মক তির্যক কটাক্ষের কৌতুকাবৃত বিষয় ভাবনায় নাটকগুলি গূঢ় ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। বনফুলের দুঃসাহসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে তার শ্রেষ্ঠ একান্ত নাটিকা শিককাবাবে। দশভাণ পাঁচটি নাটকের একটি সংকলন। ত্রিনয়ন বনফুলের একখানি নাট্য সংকলন গ্রন্থ। ঠুংরি চ বৈ তু হি কইকেই নাটক গুলিতে বনফুলের উদ্ভাবনী কল্পনার সঙ্গে জাতীয়তাবোধ মিশ্রিত দেশপ্রেমের পরিচয় মেলে। আর্য অনার্য সংস্কৃতির মিলন পৌরাণিক কাঠামোর আধুনিকীকরণের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার জাতীয় সংহতির ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন কটাক্ষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছদ্মবেশে। এগুলিকে নাটক না বলে নাটিকা বা প্রহসন বলাই যুক্তিযুক্ত ।

বনফুলের শিল্পী জীবনে কাব্য- নাট্যচর্চায় বৈচিত্র্যের সম্ভার

বনফুলের শিল্পী জীবনে কাব্য নাট্যচর্চায় যে বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভার তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র পরিসরে একেবারেই সম্ভব নয়। বনফুল তাঁর আশৈশব লালিত জীবনবোধ, বিজ্ঞান চর্চা, ডাক্তারির পেশাগত অভিজ্ঞতা, মানুষকে কাছ থেকে দেখার প্রত্যক্ষতা সব মিলিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতা সম্পন্ন এক আশ্চর্য জীবন প্রত্যয় বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বনফুলের সাহিত্যানুভূতিকে সময়ের তুলনায় কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। বনফুলের মধ্যে না ছিল রবীন্দ্রানুসারিতা, না ছিল কল্লোলীয় বোহেমিয়ানিজম। বনফুল জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে সরল ভাষায় অনুগল্পের আকারে জীবনের চরম বাস্তবকে স্পষ্ট করে তুলেছেন স্বপ্ন বাক্য জালে। বিচিত্র উদ্ভাবনী কল্পনার সঙ্গে বাস্তবোচিত জীবন রহস্যশালার এক নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন বনফুল তার কাব্য ও নাটকে। বনফুলের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, সদা সতর্ক প্রহরীর মতো জীবন ও সাহিত্য ক্ষেত্রকে সমানভাবে প্রত্যক্ষ করেছিল। মানুষের আচার-আচরণ জীবন বৃত্তি সবই তাঁর সাহিত্য রচনার প্রেরণা। সাহিত্য সৃষ্টির আবেগের বশে তিনি ডাক্তারি পেশায় হয়তো সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি, কিন্তু মানুষের শরীরের সঙ্গে মনের রসদ দেবার প্রেরণায় তাঁর উদার চিকিৎসকের নিরলংকৃত মন তাঁকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সাহস জুগিয়েছিল। তাই বৃত্তি বা পেশাকে দূরে সরিয়ে বনফুল হয়ে উঠলেন বিংশ শতকের বাংলা কাব্য ও নাট্য সাহিত্যধারার এক নতুন মুখ।।

পাদটীকা :

১।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩।পৃষ্ঠা:- ৩৯।

২।। তদেব। পৃষ্ঠা –৪১।

৩।। তদেব। পৃষ্ঠা –৪২।

৪।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা -৩২।

৫।। তদেব। পৃষ্ঠা –৩৪।

৬।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩।পৃষ্ঠা:-৪২।

৭।। তদেব। পৃষ্ঠা –৯৫।

৮।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা - ২৪-২৫।

৯।। তদেব। পৃষ্ঠা –৩৩।

১০।। তদেব। পৃষ্ঠা –৩৩-৩৪।

১১।। বনফুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ডঃ নিতাই বসু সম্পাদিত। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১। পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২০। পৃষ্ঠা:- ৫৫-৫৬।

১২।। তদেব। পৃষ্ঠা –৮৭-৮৮।

১৩।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩।পৃষ্ঠা:-১০৫।

১৪।। বনফুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ডঃ নিতাই বসু সম্পাদিত। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১। পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২০। পৃষ্ঠা:- ১৫।

১৫।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা -৩৯।

১৬।। তদেব। পৃষ্ঠা –৪০।

১৭।। তদেব। পৃষ্ঠা –৫৭।

১৮।। তদেব। পৃষ্ঠা –৫৬।

১৯।। বনফুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ডঃ নিতাই বসু সম্পাদিত। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১। পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২০। পৃষ্ঠা: ২০-২১।

২০।। তদেব। পৃষ্ঠা –৩৮।

২১।। তদেব। পৃষ্ঠা –৭৬।

২২।। তদেব। পৃষ্ঠা –৩৫।

২৩।। তদেব। পৃষ্ঠা –৩৭।

২৪।। তদেব। পৃষ্ঠা –৯১।

২৫।। তদেব। পৃষ্ঠা –৯৭।

২৬।। তদেব। পৃষ্ঠা –১০৪।

২৭।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা -৬৫।

২৮।। তদেব। পৃষ্ঠা –৬৬।

২৯।। তদেব। পৃষ্ঠা –৬৭।

৩০।। বনফুলের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ডঃ নিতাই বসু সম্পাদিত। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১। পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২০। পৃষ্ঠা: ৪১।

৩১।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা -২৩১।

৩২।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩।পৃষ্ঠা:১০১।

৩৩।। তদেব। পৃষ্ঠা –১১৩।

৩৪।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা: ২৩২-২৩৩।

৩৫।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩। পৃষ্ঠা –২৬৪।

৩৬।। রবীন্দ্র স্মৃতি। বনফুল।প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫। পুনর্মুদ্রণ ২০১১। পৃষ্টা – ৪০-৪১

৩৭।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩। পৃষ্ঠা –১৯৮।

৩৮।। রবীন্দ্র স্মৃতি। বনফুল।প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫। পুনর্মুদ্রণ ২০১১। পৃষ্টা – ৬৮

৩৯।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩। পৃষ্ঠা –২০৪।

৪০।। তদেব। পৃষ্ঠা – ২০৫

৪১ ।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী।প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা –২৪৪।

৪২।। বনফুল–'পশ্চাৎপট', চতুর্থ বাণীশিল্প সংস্করণ, জানুয়ারী ২০২৩। পৃষ্ঠা –২০২-২০৩।

৪৩।। বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য - ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী।প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭। পৃষ্ঠা –২৪৫।

৪৪।। তদেব। পৃষ্ঠা – ২৪৮।

Citation: দত্ত. মৌ., (2024) "কবিতা ও নাটক : বনফুলের অন্তরঙ্গ জীবন ভাবনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-9, October-2024.